ভাদ্রে কয়া আশ্বিনে বান
সে বৎসর নরমণ্ড গড়াগড়ি যান

# চাষের কথা

ভাদ্র আশ্বিন পবে বাও, খাল কেটে ঘরে যাও

বর্ষ ১৫ ।। সংখ্যা ৫ ।। সেপ্টেম্বর-অক্টোবর ২০১২ ।। ১৫ভাদ্র-১৪ কার্তিক ১৪১৯

## সাইকেল দিয়ে বিদ্যুৎ

পুনার চন্দ্রকান্ত পাঠক এক বিদ্যুৎ উৎপাদন যন্ত্র বানিয়েছেন। এই যন্ত্র দিয়ে আলো জ্বালানো যায়, জলসেচ করা যায়। এই যন্ত্র বানাতে লাগে খালি একটা সাইকেল।

নতুন পাত

একটা সাইকেল নিয়ে তার সামনের চাকা থেকে টায়ার-টিউব-মাডগার্ড খুলে ফেলতে হবে। ডাবল স্ট্যান্ড ফেলে সাইকেলকে এক জায়গায় দাঁড় করাতে হবে। একটা ভি 'ফ' দিয়ে সামনের চাকার রিমের সঙ্গে একটা ডায়নামোকে যুক্ত করতে হবে। এই ডায়নামো সাইকেলের ক্যারিয়ারে থাকবে।

এবার সাইকেলটা টানা একঘন্টা প্যাডেল করতে হবে। একঘন্টা প্যাডেলে ৩৬ ওয়াটের মতো বিদ্যুৎ উৎপাদিত হবে। যে বিদ্যুতে ৩-৪ ওয়াটের সিএফএল বাতি ৩ ঘন্টা জ্বলবে।

এই যন্ত্রটা চাষজমির কাছে কোনো জলাশয়ের (৫-৭ মিটার গভীরতা) ধারে নিয়ে বসানো যেতে পারে। বসালে এই যন্ত্র মিনিটে ৩০ থেকে ৪০ লিটার জলসেচ করতে পারবে।

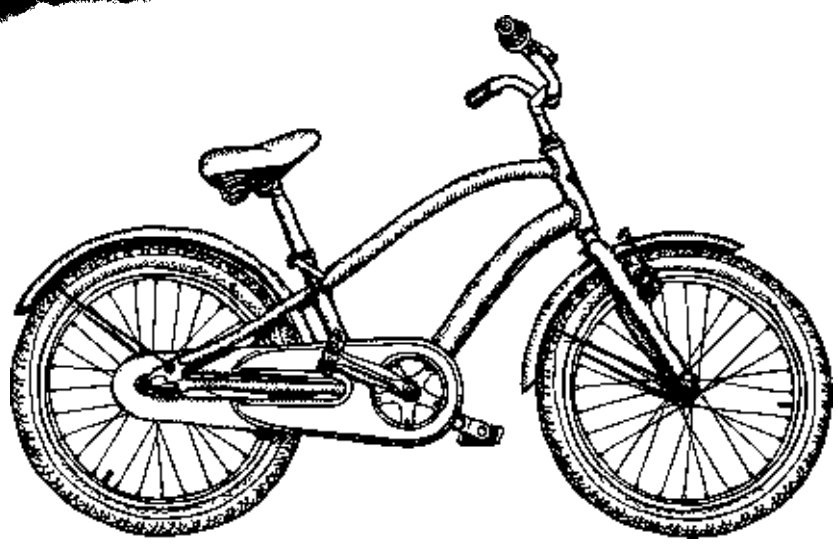

ন্যাশনাল ইনোভেশন ফাউন্ডেশন নানাভাবে এই কাজে উৎসাহ জুগিয়েছে। ফাউন্ডেশন এই কাজের জন্য পুরস্কৃতও করেছে।

ভাষাবদল :: অনিকেত

যোগাযোগ :
**শ্রী চন্দ্রকান্ত পাঠক**
১৪৪, নারায়ন পেঠ, পুনে ৪১১ ০৩০
ইমেল : mtc 1964@edifmail.com
দূরভাষ : ০২০ ২৪৪৫ ২৬২০
মোবাইল : ৯৮৯০৭৯২০

হিন্দু ২৯ সেপ্টে ম্বর, ২০১১

অ ন্য পা তা য়

কিষান স্বরাজ নীতি : ২

জিনশস্যের লেবেলিং:৫

## পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার (২০০৭-২০১২) কৃষি

চলতি পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার প্রথম তিন বছরে কৃষিক্ষেত্রে (আনুষঙ্গিক ক্ষেত্রসহ) গড় বৃদ্ধি ২.০৩ শতাংশ। এই বৃদ্ধি পরিকল্পনায় উল্লিখিত বার্ষিক সম্ভাব্য ৪ শতাংশ বৃদ্ধির নিরিখে। পরিকল্পনার প্রথম বছরে (২০০৭-২০০৮) কৃষিক্ষেত্রে এক উল্লেখযোগ্য সাফল্য লক্ষ্য করা যায়। এই বছরের বৃদ্ধির মাত্রা ছিল বার্ষিক ৫.৮ শতাংশ। যদিও পরের দু বছরে এই মান ধরে রাখা যায়নি। পরন্তু ২০০৮-০৯ - এ এই অঙ্ক ০.১শতাংশে পৌঁছেছিল। অথচ ২০০৮-০৯ বছর-ই রেকর্ড পরিমাণ খাদ্যশস্য উৎপাদনের বছর। এই বছরে ২৩৪.৪৭ মিলিয়ন টন খাদ্যশস্য উৎপাদনের বছর। এই বছরে ২৩৪.৪৭ মিলিয়ন টন খাদ্যশস্য উৎপাদিত হয়েছিল। কৃষিক্ষেত্রে গড় অভ্যন্তরীণ উৎপাদনের এই অবনমনের কারণ তৈলবীজ, তুলো, পাট ও মেস্তা এবং আখের উৎপাদন কমে যাওয়া। ১৯৭২ থেকে দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমী বায়ুর অনিয়ম ও তার ফলস্বরূপ খরিফ খাদ্যশস্যের ফলন উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পেলেও রবিশস্যের ফলন ভালো হওয়ার দরুন ২০০৯-১০-এ এই বৃদ্ধির অঙ্ককে সামান্য উঠিয়ে আনা গিয়েছিল। এই বছর এই বৃদ্ধি উঠল ০.৪ শতাংশে। রবিশস্য রক্ষা করতে সরকার কিছু আগাম ব্যবস্থা নিয়েছিল এবং তার সুফলও পাওয়া গিয়েছিল— রবিশস্যের ওপর খরিফ মরশুমের খরার প্রভাব পড়েনি। পরিকল্পনার প্রথম ৪ বছরে কৃষির বার্ষিক বৃদ্ধি এসে দাঁড়িয়েছে ২.৮৭ শতাংশে। কিন্তু এই লক্ষ্যমাত্রা মাফিক বার্ষিক গড় ৪ শতাংশ বৃদ্ধির মাত্রা রক্ষা করতে ২০১১-১২ আর্থিক বছরে এই বৃদ্ধিকে ৮.৫ শতাংশে পৌঁছাতে হবে।

জানেন কি

২০০৫-২০০৬ থেকে ২০০৮-০৯ এই ৪ বছরে খাদ্যশদ্যের রেকর্ড পরিমাণ উৎপাদন। ২০০৮-০৯ এ যা ২৩৪.৪৭ মিলিয়ন টনে পৌঁছায়। ২০০৯ সালে দেশের অনেক অংশে দীর্ঘকালীন খরার দরুন ২০০৯-১০ আর্থিক বছরে উৎপাদন নেমে দাঁড়ায় ২১৮.১১ মিলিয়ন টনে (ফাইনাল-এস্টিমেট) ওই বছরে অন্য শস্যগুলোর উৎপাদনও বেশ কমে। ৯ ফেব্রুয়ারি ২০১১ তারিখে কৃষি মন্ত্রক প্রকাশিত দ্বিতীয় অ্যাডভান্স এস্টিমেট অনুযায়ী আগের বছরের ২১৮.১১ মিলিয়ন টনের জায়গায় ২৩২.০৭ মিলিয়ন টন ধরা হয়।

২০১০-১১ আর্থিক বছরে খাদ্যশস্যের সম্ভাব্য উৎপাদন আগের বছরের ২১৮.১১ মিলিয়ন টনের জায়গায় ২৩২.০৭ মিলিয়ন টন ধরা হয়। এই পরিমাণ ২০০৮-০৯ এর যে রেকর্ড পরিমাণ খাদ্যশস্য, তার ঠিক নিচেই অবস্থান করছে।

Economic Survey 2010-11 প্রতিবেদনের Agriculture and Food Management অধ্যায় থেকে Performance of Agriculture Sector...এ Crop production অংশের ভাষান্তর।

ভাষাবদল : দীপ্র

সম্পাদকীয়

# ভারতের কৃষি-সাম্রাজ্যবাদ !

দেশের বড় বড় কৃষি-ব্যবসায়ী কোম্পানি ইথিওপিয়ায় গিয়ে জমি কিনে চাষবাস শুরু করে দিয়েছে। এই কাজে জড়িয়ে আছে ৩৫টির বেশি কোম্পানি। আর তাদের নেওয়া জমির পরিমাণ দিল্লির আয়তনের সমান। এই কাজ করতে গিয়ে তারা চাষিদের জমি থেকে উৎখাত করছে। উৎখাত হওয়া চাষির যে এই সব খামারে সবসময় স্থায়ী কাজ মিলছে এমনও নয়। আর মজুরি বাবদ যা মিলছে তাও ইথিওপিয়ার মজুরির মানের নীচে। এইসব কোম্পানি ইথিওপিয়ায় চাষ করতে গিয়ে ওখানকার সরকারের কাছে বিবিধ সুযোগ সুবিধা পাচ্ছে। আর অবাধে জমি ও জলসম্পদ ব্যবহার করছে।

ইথিওপিয়ার ফলন বিক্রি হবে চড়া দামে বিদেশের বাজারে। আর আগুন খিদেয় পুড়ে খাক হয়ে যাবে ইথিওপিয়ার পাকস্থলী।

সম্পাদক

সম্পাদক
সেপ্টেম্বর অক্টোবর ২০১২

# কিষান স্বরাজ নীতি ও দাবিসনদ

কৃষিতে বাড়তে থাকা সংকট, সংকটের আশু নিষ্পত্তি ও দেশবাসীর চিন্তায় কৃষির অগ্রাধিকারের দাবিতে গত ২ অক্টোবর থেকে ১১ ডিসেম্বর ২০১০ দেশজুড়ে এক পদযাত্রা অনুষ্ঠিত হয়। পদযাত্রার নাম **'কিষান স্বরাজ যাত্রা'**। পদযাত্রা হয় দেশের ২০টি রাজ্যের ভেতর দিয়ে। অংশ নেয় দেশের নানা রাজ্যের কৃষক ও সমাজকর্মীরা।

দেশে এখন এক বিকল্প জাতীয় কৃষিনীতি চাই, যে কৃষিনীতির ফলে দেশের কোটি কোটি ক্ষুদ্র, প্রান্তিক ও মাঝারি চাষি চাষ থেকে আবার লাভের মুখ দেখবে—তারা আবার খেয়েপরে ভালোভাবে বাঁচবে। সমস্ত মানুষের খাদ্য নিরাপত্তা ও একটা মজবুত গ্রামীণ অর্থনীতির জন্যও এই উদ্যোগ খুব জরুরি।

এটা এখন জলের মতো পরিষ্কার যে বিদেশী ধাঁচার কৃষি আর আমাদের দেশে চলবে না। এই চাষ আমাদের পরিবেশের—আমাদের স্বাস্থ্যের খুব ক্ষতি করেছে। সরকারের কোটি কোটি টাকার ভরতুকি গেছে সার ও কীটনাশক কোম্পানির ঘরে—যারা দেশের জনসংখ্যার মাত্র ২ শতাংশ। যে দেশের লাখো লাখো মানুষের কাছে এখনো চাষবাসই একমাত্র বেঁচে থাকার উপায়, সেখানে এসব চলতে পারেনা।

আমাদের চাষবাস দাঁড়িয়ে আছে আমাদের প্রকৃতি-পরিবেশ ঘিরে, দাঁড়িয়ে আছে দেশীয় প্রযুক্তি ও জ্ঞানের উপর। প্রকৃতিমুখী—জৈব চাষ ও ছোট জোতের ভালো ফলনই দেশের কৃষির একমাত্র দিশা হতে পারে। কৃষকের জীবন-জীবিকা, মাটি-জল-পরিবেশ ও জনস্বাস্থ্যকে উন্নয়নে প্রধান গুরুত্ব দিতে হবে। উন্নয়নের এই পথেই ভারত বিশ্বের দরবারে এক জ্বলন্ত উদাহরণ হিসেবে দেশকে দাঁড় করাতে পারে।

আমরা যে নয়া কৃষিনীতির কথা বলছি, তাতে আমরা কৃষকের জীবিকার নিশ্চয়তা, বাস্তুতন্ত্রের সুস্থায়িত্ব, কৃষির ওপর কৃষক তথা দেশের মানুষের অবাধ অধিকার ও আমজনতার উপযুক্ত পরিমাণ-পুষ্টিকর-বৈচিত্রময়-বিষমুক্ত খাদ্য, এই চার বিষয়ের ওপর জোর দিতে চাইছি।

একে একে পরপর আমরা বিষয়গুলো রাখছি:

**১. কৃষক পরিবারের অর্থনৈতিক নিরাপত্তা ও রোজগারের নিশ্চয়তা:**

এতদিন অব্দি সরকার যে যে কৃষিনীতি বানিয়েছে বা কৃষি নিয়ে যা যা পদক্ষেপ নিয়েছে, তাতে কৃষকের কোনো ভালো হয়নি। ফলে সচ্ছল গ্রামীণ অর্থনীতির ভাবনা কথার কথাই থেকে গেছে। অন্যদিকে কৃষিতে বাড়তে থাকা সংকটের

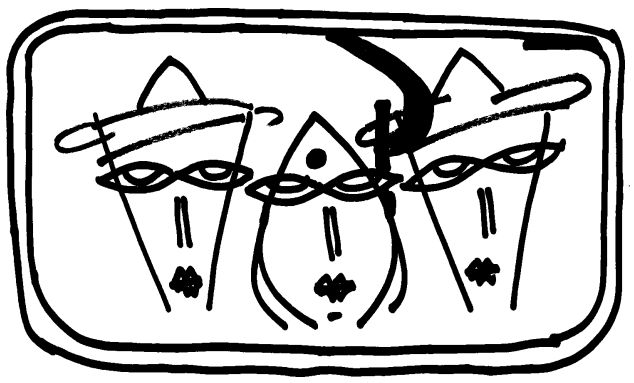

ছায়া পড়েছে খেতমজুর ও ভাগচাষির ওপর। সংকটের ছায়া পড়েছে, দেশের জনসমষ্টির খাদ্য তথা পুষ্টি নিরাপত্তায়। কৃষিপণ্যের দাম নির্ধারণ বা খাদ্য নিরাপত্তা ইত্যাদি নিয়ে যত সরকারের তরফ থেকে যত নীতি এসেছে তার কোনোটাতে কোথাও 'দেশের বিশাল পরিমাণ মানুষ খাদ্য উৎপাদনের সঙ্গে জড়িত' এই কথাটা গুরুত্ব পায়নি। কৃষিপণ্যের দাম ঠিক করার সমস্ত উদ্যোগ-আয়োজন খালি ক্রেতা ও শিল্পকে সামনে রেখে করা হয়েছে।

চিন্তা

অথচ দাম নির্ধারণের এই পদ্ধতিতে চাষির সমস্যা আরো তীব্র হয়। চাষিকে খালি ক্রেতা হিসেবে দেখে তাকে সস্তায় খাদ্য সরবরাহের নীতি, আদতে চাষির জীবিকাকে হেয় করে দেখে। দেশের গরিবগুর্বো দলের অনেকটাই জুড়ে আছে এই চাষিরা। জাতীয় কৃষি কমিশন বলছে, কৃষির উন্নতি মাপা উচিত কৃষক পরিবারের আয়ের নিক্তিতে...অথচ তার থেকে সরে, আমরা কৃষির উন্নতির মাপকাঠি করেছি বছরে কত কোটি টন খাদ্যশস্য ও অন্যান্য দ্রব্য ফলেছে তার ওপর।

সরকার একনাগাড়ে ফিরিস্তি দিয়ে যাচ্ছে যে, সে কত টাকা কৃষিতে ভরতুকি দিয়েছে—কত টাকা কৃষিতে ঋণ দিয়েছে ইত্যাদি ইত্যাদি। কিন্তু সরকার একবারও ভেবে দেখছে না যে, তার কৃষিনীতির ফলে কৃষকের আয় কতটা বাড়ল বা কৃষকের জীবনযাত্রার মানের কতটা উন্নতি হল। অসংগঠিত ক্ষেত্র নিয়ে জাতীয় কমিশনের ২০০৭-এর এক সমীক্ষা বলছে, পরিবার পিছু গড়ে একজন চাষির এখন মাসিক আয় দাঁড়িয়েছে ১৬৫০ টাকা, আর মাস প্রতি ব্যয় ২১৫০ টাকা। হিসেবমতো দারিদ্রসীমার নীচে বাস করলেই খরচ এমন হতে পারে। ইতিমধ্যেই এই পরিবারগুলো অভাব মেটাতে ধারদেনায় জড়িয়ে পড়েছে। এই অবস্থা তৈরি হওয়ার গভীর কতগুলো কারণ আছে।

**ক. ফসলের ন্যায্য দাম না পাওয়া**

কৃষিপণ্যের মূল্য নির্ধারণ কমিশন ধান-গম-আখ-এর যে দাম ঠিক করেছে তার ভেতর ফসলের উৎপাদন ব্যয়ের অনেককিছুই ধরা হয়নি। ধরা হয়নি জল, জমি, পরিবারের শ্রম, তদারকি, সার-বীজ-কীটনাশক বা চাষির সংসারের ভরণ-পোষণের বেড়ে যাওয়া খরচকে।

- এইসব দাম নির্ধারণ, ভরতুকি, পরিবহনের সুবিধে বা রফতানির সরকারি নীতি, শিল্পকে কম পয়সায় কাঁচামাল জোগাতে আর দেশের মানুষকে কম পয়সায় খাবার দিতে।
- মুদ্রাস্ফীতির ফলে চাষির চাষের খরচ ও সংসার খরচ বাড়লেও, সরকারের নজর কিন্তু কৃষিপণ্যের দাম কমানোর দিকেই। এই অবস্থা অবশেষে কৃষকের ওপর সবদিক থেকেই ভীষণ চাপ তৈরি করে।

- বিশ্ববাণিজ্য সংস্থা, নানা আঞ্চলিক ও দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্যিক চুক্তি ইত্যাদিতে ভারত সই করার পর দেশের বাজার এখন মুক্ত, সেখানে ঢুকে পড়ছে সস্তার বিদেশি জিনিস।

**এইভাবে ফসলের ন্যায্য দামের বদলে, চাষি নিজে শেষ হয়ে অন্যকে অনুদানের ব্যবস্থা করে**

**খ. চাষির সংসার-খরচ চালানোর কথা আলোচনার বাইরে থেকে যাওয়া**

শিক্ষা-স্বাস্থ্য ইত্যাদি জরুরি পরিষেবা থেকে সরকার মুখ ঘুরিয়ে নিয়েছে। গত-দুদশকে এইসব ক্ষেত্রে পরিষেবা ব্যয় বহুগুণ বেড়েছে। কিন্তু ফসলের ন্যূনতম সহযোগ মূল্য ঠিক করার সময় সরকারের এসব খেয়াল থাকে না।

**গ. কৃষিতে বরাদ্দ সরকারি সাহায্য কৃষকের জন্য নয়**

সরকারি অনুদান-ঋণ-বিমা ইত্যাদির সুযোগ সবসময়ই একটা বড় অংশের কৃষকদের নাগালের বাইরে থাকে। পরিকল্পনা ও প্রয়োগ উভয় ক্ষেত্রেই একথা সত্যি।

- ভারতে কৃষিতে ভরতুকির হার তুলনামূলকভাবে অনেক কম। এই ভরতুকি আসে সার-বীজ ও গণবণ্টন ব্যবস্থার ভেতর দিয়ে। আর এই অথের্র একটা বড় অংশ যায় রাসায়নিক সারে। যার পরিমাণ-প্রায় ১ লাখ কোটি, যা গত কয়েক বছর আগের কেন্দ্রীয় বাজেটের ১২%। অথচ যে সব চাষি দেশজ পদ্ধতিতে মাটির উর্বরতা বাড়াচ্ছে বা নিজের রাখা বীজে চাষ করছে তাদের জন্য কোনো অনুদান নেই।
- ব্যাঙ্কের যে ১৮% কৃষিঋণ তা চলে যাচ্ছে সার - কীটনাশক ও খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ শিল্পে। ২৫,০০০-এর নীচে যে ছোট কৃষি- ঋণ তার সুযোগ কমতে কমতে ২০০৬-এ ৭৫ শতাংশে দাঁড়িয়েছে। ১৯৯০-এ এই ঋণের গ্রাহক শতাংশের হিসেবে ছিল ৪৯.৬%,২০০৬-এ তা হয়েছে ১৩.৩%। একই সময়ে এককোটি টাকার ওপর যে কৃষিঋণ, তা বেড়েছে ৪০০%। ভাগচাষিদের চাষবাসের চুক্তি, শর্ত ইত্যাদির কোনো লেখাপড়া না থাকার দরুন, তারা এ ধরনের কোনো সরকারি

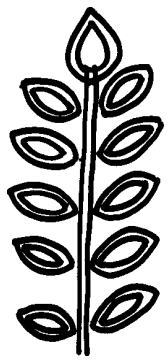

সুবিধে পায় না। আবার জমির ইজারার জন্য অর্থের পরিমাণও একর প্রতি এখন ১০,০০০ থেকে ২৫,০০০, সুদের হার হয়েছে ৩০% থেকে ৬০%। ফলে চাষ করে ভাগচাষিরও আর পোষাচ্ছে না।

IAASTD নামের কৃষি মূল্যায়নের প্রতিবেদনেও কৃষকের খাদ্য ও জীবিকার নিরাপত্তার কথা উঠে এসেছে, উঠে এসেছে ছোট জোতের চাষিকে জমি বাজার ও অর্থকরী সুযোগ সুবিধা দেওয়ার।

- এমন অবস্থায় চাষের অর্থনৈতিক সুস্থায়িত্ব ও চাষি পরিবারের আয় বাড়ানোয় জোর দেওয়া সরকারের জরুরি কাজ। এটা যে কেবল চাষের ভালো করবে তা নয়, পুরো গ্রামীণ অথনীতিতে এর ফলে সাড়া পড়বে।

**ঘ. বেঁচে থাকার মতো ন্যূনতম উপার্জনের নিশ্চিতি**

ছোট জোত বাঁচলেই মানুষ খেয়ে বাঁচবে, পৃথিবীজোড়া খাদ্য সংকটের অভিজ্ঞতা থেকে আমরা একথা শিখেছি। তাই ছোট জোত খুব জরুরি। কৃষিতে কাজের সুযোগ কমিয়ে–চাষের সামগ্রীর দাম বাড়িয়ে আমরা সেই ছোট ও প্রান্তিক চাষির সংকট বাড়াচ্ছি। কিন্তু পুরো পরিবারের মাসিক ব্যয়-এর নিরিখে ন্যূনতম আয়ের নিরিখ স্থির করা জরুরি। রাষ্ট্রপুঞ্জের ফাও, ইউএনডিপি, হু, ইউনাইটেড নেশনস এনভায়রনমেন্টাল প্রোগ্রাম ও বিশ্বব্যাঙ্ক মিলে IAASTD নামের কৃষি মূল্যায়নের প্রতিবেদনেও কৃষকের খাদ্য ও জীবিকার নিরাপত্তার কথা উঠে এসেছে, উঠে এসেছে ছোট জোতের চাষিকে জমি-বাজার ও অর্থকরী সুযোগসুবিধা দেওয়ার।

**২. চাষের সুস্থায়িত্ব :**

দশকের পর দশক ধরে রাসায়নিক-নির্ভর কৃষি প্রকৃতিতে বিপর্যয় ডেকে এনেছে। কৃষককে এখন তার বড়সড়ো মাশুল গুনতে হচ্ছে।

এই চাষের ফলে মাটির স্বাস্থ্য বদলে গেছে রাতারাতি। বন্ধু পোকা-পাখি, গাছপালা, কেঁচো সব গেছে লোপাট হওয়ার মুখে, জল দূষিত হয়েছে, মাটির নীচের জল প্রায় শুকিয়ে যাচ্ছে। প্রচুর সার দিয়েও কিছু হচ্ছে না, ফলন কমছে। সরকারের রাসায়নিক সারে ভরতুকির অঙ্ক ১ লাখ ছুঁয়েছে, কিন্তু কাজের কাজ কিছু হয়নি। পরিবেশ নিয়ে ২০০৯-এর সরকারি প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, সবুজ বিপ্লবে ভূমি ও জলের মাত্রাধিক ব্যবহার হয়েছে, লাগামছাড়া ব্যবহার হয়েছে রাসায়নিক সার-কীটনাশকের–ভূমিক্ষয় বেড়েছে, মাটিতে নুন এসেছে, মাটি উর্বরতা হারিয়েছে। প্রতিবেদন আরো দেখাচ্ছে যে, দেশের ১৪২ মেগা হেক্টর চাষজমির ৪৪ মিলিয়ন হেক্টর জমির মান খারাপ হয়েছে নুন, অম্ল, ক্ষার ও জলাবদ্ধতার জন্য।

রাসায়নিক কীটনাশকের ব্যবহারে বন্ধ্যাত্ব, জন্মগত ত্রুটি, আগে ভূমিষ্ঠ হওয়া, কিডনির সমস্যা, ক্যান্সার ইত্যাদি ব্যাপকভাবে দেখা দিয়েছে। কীটনাশকের বিষে মারা গেছে হাজার হাজার কৃষক। এইসব সমস্যার দিকে চোখ ফেরানো বিশেষভাবে জরুরি।

এদিকে জলবায়ু বদলের ফলে বৃষ্টি অনিয়মিত, খরা-বন্যা বাড়ছে। রাসায়নিক সার-কীটনাশকের ফলে দূষিত হয়েছে পানীয় জল ও মাটির তলার জল। যেখানে জল কম, সেখানে জল বেশি লাগে এমন ফসল লাগিয়ে, নলকূপ খুঁড়ে মাটির তলার জলের পরিমাণ কমেছে।

এর সঙ্গে এবার যুক্ত হয়েছে জিনশস্য। জিনশস্য আসছে পরিবেশ-জীবজগতের নিরাপত্তা ও আনুষঙ্গিক সর্তকতা রক্ষার দিককে পরোয়া না করেই। জিনশস্য চাষের জমিতে এলে কৃষকের ক্ষতি হবে, পরিবেশের ক্ষতি হবে, আমাদের ক্ষতি হবে। বিটি তুলো চাষের পরিণাম বলে দিচ্ছে যে এই তুলো নিয়ে আসার আগে এই ফসল থেকে মানুষ ও পশুর কী ক্ষতি হবে, তা পরখ করা হয়নি। গত পাঁচ-ছয় বছরে এই তুলো চাষের ফলে অন্ধ্রে মারা গেছে ২৫০০-এর মতো গৃহপালিত পশু, বহু কৃষক ও খেতমজুর আক্রান্ত চামড়ার রোগ–জ্বালা হওয়া–ফুলে যাওয়ার অসুখে। খারাপ হয়েছে মাটিও। দেশের জনমত জিনশস্যের বিপক্ষে, জিনশস্যের বিপক্ষে অনেক রাজ্য সরকারও। জিনশস্য তথা বিটি বেগুনের চাষ নিয়ে, দেশের ছয় বিজ্ঞান সংস্থার যে রিপোর্ট তার নিরপেক্ষতা নিয়েও সংশয় তৈরি হয়েছে।

ভারতের কৃষিকে প্রকৃতিমুখী–সুস্থায়ী করা এখন আশু প্রয়োজন। IAASTD প্রতিবেদনেও সেই কথার প্রতিধ্বনি আছে। এই প্রতিবেদনেও বলা হয়েছে 'কৃষির উন্নতি ও সুস্থায়িত্বের জন্য মাটি তৈরি, জলের ব্যবহার, রোগপোকা নিয়ন্ত্রণ, জৈব বৈচিত্র রক্ষা, রোগের বাহক নিয়ন্ত্রণ ইত্যাদি কাজ কৃষকের হাতে ছেড়ে দিতে হবে–কৃষক তার দেশজ জ্ঞান দিয়ে, সংস্কৃতি দিয়ে এই কৃষিকে রক্ষা করবে।'

হালে দেশজুড়ে সুস্থায়ী কৃষির বেশ প্রসার হয়েছে। সবচেয়ে বড় কাজ হয়েছে অন্ধ্রে, সেখানে ২৮ লাখ একর জমিতে সুস্থায়ী পদ্ধতিতে চাষ হচ্ছে। এই কাজে অন্ধ্র সরকারও সহযোগিতা করছে। পাশাপাশি এসআরআই-এরও প্রসার হয়েছে–ধানের বদলে গম আখ ও রাগি চাষেও এই পদ্ধতি অনেক রাজ্যে ব্যবহার করা হচ্ছে। জৈব উপায়ে চাষ বাড়ছে। সুভাষ পালেকারের 'শূন্য বাজেট প্রাকৃতিক কৃষি-র থেকেও কৃষকের সুফল মিলছে।

জৈব কৃষি সম্ভব নয় একথা এখন আর বলা যাবে না। জৈব কৃষিই এখন দেশের বর্তমান খাদ্য-চাহিদা–মেটানোর একমাত্র পথ। আমাদের পরিকল্পনা, কর্মসূচি, কৃষিনীতি, গবেষণা, চাষ সর্বত্র জৈব কৃষির ধারণাকে ফেরোনো উচিত। এটা আশু কর্তব্য।

**৩. কৃষির ওপর কৃষকের সমূহ নিয়ন্ত্রণ:**

কৃষির সঙ্গে জড়িত জনগোষ্ঠীর কাছে জল-জমি-জঙ্গল-বীজ হল বেঁচে থাকার অপরিহার্য রসদ। কৃষকের জীবন-জীবিকার সঙ্গে জড়িয়ে থাকা এই রসদ কখনই রাক্ষুসে বহুজাতিকের হাতে তুলে দেওয়া যাবে না।

বিশাল পরিমাণ চাষজমি চলে যাচ্ছে অন্য কাজে। হালের তথ্য দেখাচ্ছে, অন্ধ্রপ্রদেশে গত বিশ বছরে অন্য কাজের জন্য চলে গেছে লাখ লাখ একর চাষজমি। জমির ঊর্ধ্বসীমা আইন ভেঙে যার অনেকটাই গেছে কৃষি-কারবারি কোম্পানির দখলে। সেজ কোস্টাল করিডর, শিল্প ও সড়ক তৈরির অজুহাতে ঘরছাড়া হয়েছে অজস্র কৃষক। উত্তরপ্রদেশ থেকে তামিলনাড়ু, সারা ভারতজুড়ে যা এক লাগাতার উচ্ছেদ-বিরোধী আন্দোলনের জন্ম দিয়েছে।

জঙ্গল নিয়েও তৈরি হয়েছে একই ধরনের সমস্যা। সংবিধান ভেঙে জনজাতিকে বঞ্চিত করা হয়েছে অরণ্য সম্পদের অধিকার থেকে। আর জলসম্পদের ওপর নিয়ন্ত্রণ ও জলকে বেসরকারি মালিকানায় নিয়ে আসা, কৃষির আর এক সমস্যা।

জল-জঙ্গল-জমি লড়াই-এর সঙ্গে এবার যুক্ত হয়েছে বীজ রক্ষার লড়াই। বীজ-বৈচিত্রের বেসরকারিকরণ শুরু হয়েছে। বীজ ও জার্মপ্লাজম (বীজের সারবস্তু) চলে যাচ্ছে কর্পোরেট কব্জায়। হালে এর সবচেয়ে বড় উদাহরণ হল, দেশের পাঁচটি রাজ্য সংকর ভুট্টা বীজ কিনবে বলে মনস্যান্টোর সঙ্গে হাজার হাজার কোটি টাকার চুক্তি করেছে। তথ্য বলছে, এই চুক্তির সর্বমোট অর্থমূল্য দাঁড়াচ্ছে দুশো কোটি টাকা। যা হিসেবমতো ভারতের বীজ বাজারের পাঁচ শতাংশ। বহু সরকারি গবেষণা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে বহুজাতিকের গবেষণা বিষয়ক সন্ধি হয়েছে। যার থেকে কৃষকের কোনো লাভ হবে না, লাভ হবে বহুজাতিকের। অন্ধ্রপ্রদেশ ও গুজরাট সরকারের বিরুদ্ধে মনস্যান্টো মামলা করেছে এই দাবিতে যে, বীজের দাম বা বীজের রয়্যালটি সরকার নিয়ন্ত্রণ করতে পারবে না। কৃষক সংগঠন, রাজনৈতিক দল ও বিভিন্ন রাজ্য সরকারের প্রতিবাদ ও চাপ সত্ত্বেও সরকার বীজ বিল সংসদে এনেছে। সেখানে বীজের দাম ও স্বত্ব নিয়ন্ত্রণের সরকারি অধিকার নিয়ে একটি কথাও নেই।

কিন্তু এই শস্য বৈচিত্র সংরক্ষণ খুব জরুরি, জরুরি সংকর জাত তৈরিতে কৃষকের লোকজ জ্ঞান ও দক্ষতা সংরক্ষণ। সরকারের উচিত গ্রামে গ্রামে বীজভাণ্ডার তৈরি ও বিভিন্ন শস্যের দেশজ-সংকর জাত তৈরিতে কৃষককে উৎসাহ দেওয়া।

**৪. দেশের সমস্ত মানুষের জন্য উপযুক্ত পরিমাণ, পুষ্টিকর, বিষমুক্ত ও বৈচিত্রপূর্ণ খাদ্য**

কৃষি প্রযুক্তি-শস্য পর্যায় ইত্যাদি যাই বলা হোক না কেন, আসল কথা হল, সমস্ত দেশবাসীর উপযুক্ত পরিমাণ-পুষ্টিকর বিষমুক্ত-বৈচিত্রময় খাদ্যসামগ্রী সহজে পাওয়া। কিন্তু দেশের মানুষের কাছে এখন খাদ্য নিয়ে এই পছন্দ-অপছন্দের সমস্ত পথ বন্ধ। খাদ্য নিরাপত্তা বলতে এখন আমরা বুঝি নির্দিষ্ট পরিমাণ চাল ও গম। জেনে-বুঝে নিজের খাদ্যশস্য বাছাই ও খাঁটি খাবার দুটোই এখন বিপন্ন, এখন আবার এর

দোসর হয়েছে জিনশস্য। অন্যদিকে, কেন্দ্রীভূত গণবণ্টন ব্যবস্থা ও ভুল প্রযুক্তি কৃষির লোকজ জ্ঞান ও কারিগরিকে লোপাট করছে। সরকারকে এবার দায়িত্ব, দেশের সমস্ত মানুষের জন্য পর্যাপ্ত পরিমাণ, পুষ্টিকর, বিষমুক্ত, বৈচিত্রপূর্ণ খাদ্যের ব্যবস্থা করা, আর তা করতে হবে কৃষি-বৈচিত্র নির্ভর জৈব কৃষির মাধ্যমে।

## কৃষিনীতি ঘিরে আমাদের দাবি

**১. কৃষক পরিবারগুলির অর্থনৈতিক তথা রোজগার নিশ্চয়তা**

১.১ কৃষক পরিবারের জন্য বেঁচে থাকার মতো ন্যূনতম আয়ের ব্যবস্থা করতে হবে। রীতিমতো আইন করে ফার্মার্জ ইনকাম কমিশন বানাতে হবে, যে কমিশন ফি বছর কৃষকের আয়ের দিকে নজর রাখবে ও কীভাবে এই আয়কে যথোপযুক্ত করা যায় তা নিয়ে সরকারকে প্রস্তাব দেবে। যার ভেতর ফসলের ন্যায্য দাম সহ কৃষকের সরাসরি মাসিক ভাতার মতো প্রস্তাবও থাকতে পারে।

১.২. কৃষির উৎপাদন ব্যয় নির্ধারণের নতুন পদ্ধতি তৈরি করতে হবে। এই নতুন পদ্ধতি তৈরি হবে কৃষকের শ্রম, সম্পদ ও একজন মানুষকে ভালোভাবে বাঁচতে যা যা লাগে তার মূল্য হিসেব করে। ন্যূনতম সহায়ক মূল্য ঠিক করতে হবে কৃষকের পঞ্চাশ শতাংশ লাভ ও সংসারের ভরণ-পোষণের খরচের নিরিখে। এর কোনোরকম হেরফের ঘটলে তা সরকারি মাসিক ভাতা দিয়ে পূরণ করতে হবে।

১.৩. ফসলের ন্যায্য দামের নিরিখে খাদ্য নিরাপত্তা ব্যবস্থাকে ঢেলে সাজাতে হবে। কৃষকের বাড়তি ফসল সরাসরি কৃষকের থেকে সংগ্রহ ও স্থানীয় মজুত-বণ্টন ব্যবস্থার নিরিখে গণবণ্টন ব্যবস্থাকে সাজাতে হবে।

১.৪. ন্যূনতম সহায়ক মূল্যের যথাযথ ব্যবহারের জন্য সরকারকে মার্কেট স্ট্যাবিলাইজেশন ফান্ড তৈরি করতে হবে। দাম ওঠাপড়ার ঝুঁকি থেকে কৃষককে রক্ষা করতে হবে।

১.৫. কৃষকের বাজারের সুযোগ বাড়াতে গ্রামেই মজুতও প্রক্রিয়া-করণ ব্যবস্থা গঠনের জন্য অর্থ বিনিয়োগ করতে হবে।

১.৬. চাষে—বিশেষ করে প্রকৃতিমুখী চাষে সরকারি অনুদান দিতে হবে।

১.৭. সেচপ্রধান এলাকায় মরশুমে একর প্রতি ৪০ দিন আর বৃষ্টিপ্রধান এলাকায় মরশুমে একর প্রতি ৬০দিন হিসেবে মজুরি-অনুদান দিতে হবে। এই উদ্যোগকে রাখতে হবে এমজিএনআরইজিএ-প্রকল্পের সুযোগ-সুবিধার বাইরে।

১.৮. কৃষক-ভাগচাষি সহ কৃষিকাজে যুক্ত সকলের অবসর ভাতা ও স্বাস্থ্যরক্ষা, দুর্ঘটনাবিমা বা জীবনবিমা ইত্যাদির জন্য সামাজিক নিরাপত্তা আইন চালু করতে হবে।

**২. পরিবেশ বাঁচিয়ে কৃষি**

২.১ পরিবেশমুখী চাষকে ফেরাতে বছর প্রতি ১০% জমি ধরে নির্দিষ্ট সময়ে পরিকল্পনা তৈরি করতে হবে। পরিকল্পনার প্রয়োজনে সমস্ত অর্থ ও সহযোগিতা দিতে হবে।

২.২. সমস্ত রাসায়নিক সার ও কীটনাশক নিষিদ্ধ করতে হবে। নিষিদ্ধ করতে হবে সমস্ত ক্লাস ওয়ান ও ক্লাস টু গ্রুপের কীটনাশক। আর বাকি কীটনাশক সময়সীমা বেঁধে নিয়ে ধীরে ধীরে কৃষি থেকে সরিয়ে নিতে হবে।

২.৩. জিনশস্যের চাষ নিয়ে স্থগিতাদেশ বহাল রাখতে হবে। জিনশস্যের পরীক্ষা তথা প্রক্রিয়াজাত খাবারের আমদানি নিয়ে জোরদার জীব পরিমণ্ডল-রক্ষা আইন চালু করতে হবে।

২.৪. বর্ষা-নির্ভর চাষ ও খরা-উপযোগী চাষে জোর দিতে হবে। বর্ষা-নির্ভর চাষে কারিগরি সাহায্য নিয়ে বাজেট বরাদ্দ রাখতে হবে। ডাল-তেলবীজ-জোয়ার-বাজরা চাষের জন্য কৃষককে উৎসাহ দিতে হবে।

২.৫. কৃষি গবেষণার পঞ্চাশ শতাংশ অর্থ প্রকৃতিমুখী ও সুস্থায়ী চাষে দিতে হবে, কৃষি গবেষণা কার্যক্রমকে (NARS)-বহুজাতিকের সার-তেল-কারিগরি থেকে ঘুরিয়ে সুস্থায়ী কৃষির দিকে আনতে হবে।

২.৬. জলবায়ু বদল রুখতে জিনশস্য প্রচলনের বদলে স্থানীয় জাত ও সুস্থায়ী চাষের ওপর জোর দিতে হবে।

**৩. জনগোষ্ঠীর সম্পদ ও অধিকার রক্ষা**

৩.১. বীজ উৎপাদন ও কৃষির দেশজ জ্ঞানের ওপর কোনোরকম মেধাস্বত্ব চলবে না। কেন্দ্র-রাজ্য সরকার ও সরকারি গবেষণা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে মনস্যান্টো সহ সমস্ত বহুজাতিকের চুক্তি বাতিল করতে হবে।

৩.২. বীজ আইন চালু করে সরকারকে বীজের দাম ও বীজ উৎপাদনের স্বত্ব বাবদ অর্থ নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। রাজ্য সরকারগুলোকে বীজ লাইসেন্স, খারাপ বীজের জন্য ক্ষতিপূরণ ও বীজের দাম ও স্বত্ব বাবদ দেয় অর্থ নিয়ন্ত্রণের অধিকার দিতে হবে।

৩.৪. অকৃষি ও খাদ্য উৎপাদন-বহির্ভূত কাজে চাষের জমির জবরদস্তি অধিগ্রহণ চলবে না। চল আইন বাতিল করে নতুন প্রস্তাবের বিবেচনার ভিত্তিতে, একটি জনমুখী নতুন ভূমি অধিগ্রহণ আইন চালু করতে হবে।

৩.৫. বনাধিকার আইন যথাযথভাবে কার্যকর করতে হবে। আদিবাসী উচ্ছেদ চলবে না। শিল্প ও খনির জন্য জঙ্গল ধ্বংস বন্ধ করতে হবে।

৩.৬. জলের বেসরকারিকরণ চলবে

না। অগ্রাধিকার ভিত্তিতে জল-ব্যবহার নিয়ে ভাবতে হবে। সেচ ও পানীয় জলে জোর সংগ্রহ, মজুত ও বন্টনে। এই বন্টন-ব্যবস্থায় খাদ্য সামগ্রী হিসেবে জোয়ার, বাজরা, ডাল ও তেলবীজ অবশ্যই থাকতে হবে।

৪.১. খাবারে রাসায়নিকের মাত্রা ও জিনশস্যজাত খাবার নিয়ে ক্রেতাকে খাবারের লেবেল ও প্রাসঙ্গিক তথ্যাদির খোঁজখবর নেওয়ার অধিকার দিতে হবে।

'আশা' নামের এক সর্বভারতীয় সমন্বয় সুস্থায়ী কৃষির প্রসার, কৃষকের অধিকার প্রতিষ্ঠা, কৃষকের জীবনযাপনের মান উন্নয়ন, পরিবেশরক্ষা ও সর্বসাধারণের জন্য বিষমুক্ত পর্যাপ্ত খাদ্যের লক্ষে কয়েকবছর যাবৎ সারা ভারতজুড়ে কাজ করছে। 'আশা'-র পুরো নাম অ্যালায়েন্স ফর সাসটেনেবল অ্যান্ড হলিস্টিক অ্যাগ্রিকালচার। আশা কৃষিনীতির যে খসড়া বানিয়েছে, তার বাংলা-রূপ আমরা এখানে প্রকাশ করলাম। উৎসাহীজনের জন্য আশার বিস্তারিত যোগাযোগ-সূত্রও নীচে দিয়ে দিলাম।

ASHA, A-124/6 First Floor, Katwaria Sarai, New Delhi 110016, Phone/Fax 011 26517814

কবিতা কুরুগান্তি ০৯৩৯৩০০১৫৫০ ।।
ড. জি ভি রামনজানেলু ০৯০০০৬৯৯৭০২ ।।
কিরনকুমার ভিজা ০৯৭০১৭০৫৭৪ ।।

kavitha-kuruganti@yahoo.com
ramoo-csa@gmail.com
kiranvissa@gmail.com

ভাষাবদল : স চ

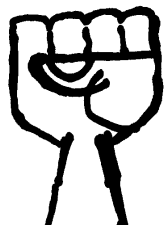



## নতুন।। বই

গৃহপালিত পশুপাখি থেকে সংসারে আয় বাড়তে পারে। তবে, তা কাজে লাগাতে জানতে হবে। জানতে হবে, আয়ের জন্য কোন্ প্রাণীকে বাছব, প্রাণীপালনের নিয়ম কী, ব্যাবসা কেমনভাবে করব, উৎপাদন খরচ কমানো যাবে কীভাবে ইত্যাদি। আমরা এসব শেখাব, প্রশিক্ষণ দেব। মুরগি পালনের এই বই সেই প্রশিক্ষণ কার্যক্রমেরই অংশ। আশা করি সকলের কাজে আসবে।

সাইজ (৫"X ৭") সাইজে ১৪ পয়েন্টে হোয়াইট প্রিন্টে ছাপা, পাতা সংখ্যা ১৬, মূল্য : ১৫ টাকা, প্রথম সংস্করণ : জুলাই ২০১২




ভারত-মার্কিন মারণ কৃষি জ্ঞান চুক্তি নিয়ে কৃষিবিদ, জিনবিদ, নদীবিদ ও অথনীতিবিদদের ৬ ক্ষুরধার রচনা এক সংগ্রহ

সাইজ (৪.৭৫"X ৭") সাইজে ১৪ পয়েন্টে ন্যাচারাল কালার কাগজে ছাপা, পাতা সংখ্যা ৭৯, মূল্য : ৫০ টাকা, প্রথম সংস্করণ : ফেব্রুয়ারি ২০১২

শ খবর

### অপুষ্টি

দেশের জনসংখ্যা ১২৪১.৫ মিলিয়ন। তার ভেতর পুষ্টিহীনতায় ভুগছে ২১৭ মিলিয়ন। হিসেবে যা জনসংখ্যার ১৮ শতাংশ। এসব বলছে ফাও-এর ২০১০-১২ সমীক্ষা।

### শিশুমৃত্যু

২০১১ সালে ৫ বছরের নীচে থাকা ৬.৯ মিলিয়ন শিশু ২০১১ সালে মারা গেছে। হিসেবে দিন-প্রতি এই মৃত্যুর সংখ্যা কমবেশি ১৯০০০ আর ঘণ্টা প্রতি ৮০০ জন। জানাচ্ছে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা।

### জিনশস্যের লেবেলিং

প্যাকেট ভরা জিনশস্যজাত খাবারে, প্যাকেটের গায়ে GM এই ইংরেজি হরফ দুটো লিখতে হবে। উপভোক্তা মন্ত্রক থেকে এমন এক বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়েছে। বিজ্ঞপ্তির ক্রম ও সূচক GSR ৪২৭। গত ৫ জুন ২০১২ বিজ্ঞপ্তিটি জারি করা হয়েছে। বিজ্ঞপ্তিটি বলবৎ হবে ১ জানুয়ারি ২০১৩ থেকে। বিজ্ঞপ্তি মোতাবেক, যে কোনো প্যাকেট করা জিনশস্যজাত খাবারের প্যাকেটের সামনের দিকে মাথার ওপরে বাধ্যতামূলকভাবে হরফ দুটো লিখতে হবে।

### কৃষি অত্যাবশ্যক পরিষেবা ?

সরকার কৃষিকে অত্যাবশ্যক পরিষেবার আওতায় আনতে চাইছে। শক্তি মন্ত্রকের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী বিরাপ্পা মউনি সম্প্রতি এমন কথা বলেছেন। বৃষ্টিপাতের অনিয়মে ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকের সাহায্যদানের জন্যই এই অত্যাবশ্যকারীয়করণ জরুরি। আপাতভাবে একথা সত্যি যে এর ফলে সেচের সুবাদে এর ফলে গ্রামে গ্রামে বিদ্যুৎ পৌঁছাবে। কিন্তু এর ফলে অধিকার হরণের ঘটনাও ঘটবে। কৃষি অত্যাবশ্যক তালিকাভুক্ত হলে যে কোনো সময় অত্যাবশ্যক। সেবা নিরাপত্তা আইন (ESMA) ব্যবহার করা যাব। এর ফলে অত্যাবশ্যক সেবায় বিঘ্ন ঘটার অজুহাতে যে কোনো প্রতিবাদীকে জাতীয় নিরাপত্তা আইনে (NSA) গ্রেফতার করা যাবে। এর ফলে (ESMA) প্রয়োগ করে কৃষক বা কৃষি মজুরের যে কোনো প্রতিবাদ কে নিষিদ্ধ করা যাবে। দখল নিয়ে দেখানো যাবে না চাষজমি জাতীয় নিরাপত্তা আইনে কারারুদ্ধ হলে বিনাবিচারে একবছর হাজতবাস। কৃষি অত্যাবশ্যক সেবার আওতাভুক্ত সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্থ হবে ক্ষেতমজুরা। তারা মজুরি বাড়ানোর দাবি কাজের শর্ত বদল বা জোটবাঁধার সমস্ত অধিকার হারাবে। জানাচ্ছে Economic Political Weekley, ২২ সেপ্টেম্বর ২০১২সংখ্যা

### এমজিএনআরইজি এতে ১৫০ দিনের কাজ

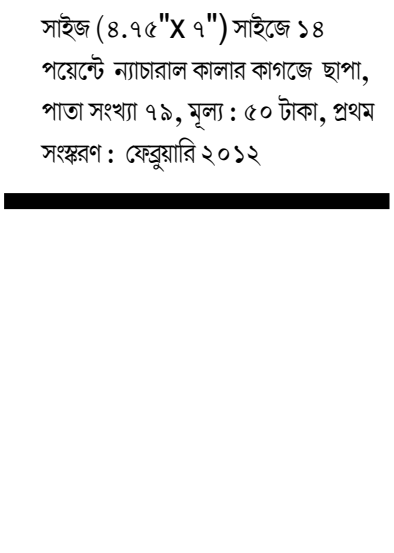

খরাক্লিষ্ট এলাকায় এমজিএনআরইজি এতে কাজের দিন বাড়ল। এই অর্থবর্ষের জন্য এমন ঘোষণা কৃষি মন্ত্রকের। খরাক্লিষ্ট এলাকার ভিতর আছে কর্ণাটক, মহারাষ্ট্র, গুজরাট, রাজস্থান। বর্ষার ঘাটতির অনেকটা পূরণ হলেও জোয়ার, বাজরার উৎপাদন এবার কম হতে পারে, ফলে খরা কবলিত এলাকায় সংকট বাড়বে। এমন মনে করেই এই সিদ্ধান্ত। আর সিদ্ধান্ত রূপায়ণের জন্য এই বছরে বরাদ্দ হয়েছে ৩৩,০০০ কোটি টাকা। সোপানস্টেপ অক্টোবর

# খরিফের মাঠ-রবির পরিকল্পনা - সুন্দরবন উপকূলীয় অঞ্চল

**দেশি ধানের উৎপাদন ক্ষেত্র তৈরি হয়েছে :**

- পাথরপ্রতিমায়-৫০টি, হিঙ্গলগঞ্জে-৩২টি, পারঘুমটি - ২০টি, ধানের নানা জাত উৎপাদন করে সংগ্রহ করা হবে।
- পাথরপ্রতিমা এবং হিঙ্গলগঞ্জে ১৫ জন চাষি পরীক্ষামূলকভাবে বলন পদ্ধতিতে, ৩ জন গোচি পদ্ধতিতে ও ১৮ জন চাষি এককাঠি ধান চাষ করেছেন। অনিয়মিত বৃষ্টিপাতে ধান রোপণে দেরি করায় ফলন কম হয়। এইসব পরীক্ষার মধ্যে দিয়ে, অনিয়মিত বৃষ্টিপাতের ক্ষতির প্রভাব ধানচাষ থেকে কতটা দূরীভূত করা যায় তা বোঝার চেষ্টা করা হচ্ছে।
- হিঙ্গলগঞ্জ,পাথরপ্রতিমা বাসন্তীর ১৭১ জন চাষি ১৭৬ বিঘে জমিতে আইপিএম-এর কিছু টেকনিক যথা বীজ বাছাই, বীজ শোধন, বার্ডপার্চ ইত্যাদি ব্যবহার করেছে।
- হিঙ্গলগঞ্জ ব্লকে ২৬ টি পরিবারের সঙ্গে ভূমির গঠন পরিবর্তনের কাজ করা হয়েছে।
- প্রতিটি পুষ্টিবাগনে আপৎকালীন ফসল, বস্তায় চাষ, মাচা ও চালের ব্যবহারের কাজ হয়েছে।
- বীজভাণ্ডারে ২৫-৩০ ধরনের সবজি বীজ সংগ্রহের কাজ করা হয়েছে।
- দলগত উদ্যোগে খাদ্যপ্রক্রিয়াকরণের কাজ যেমন ক্যাওড়া জেলি, আমড়া-তেঁতুল ও চালতার আচার এবং লংকা ও হলুদ- গুঁড়ো তৈরির কাজ হয়েছে।

**মরশুমের পরিকল্পনা :**

- SRI পদ্ধতিতে ধানচাষ।
- পয়রা চাষ, জীবাণুসার ব্যবহার।
- চাষি-বাগানিদের বীজ সংগ্রহ ও সংরক্ষণের প্রশিক্ষণ ।
- দলগত উদ্যোগে হাঁস-মুরগি পালন, ধানগোলা তৈরি ।

■■

বিশদ সন্ধান : ৯৮৩৬৯৫২৩৮১

# আশ্চর্য বই

'বিদ্যার বহুবিস্তীর্ণ' ধারার সহিত শিক্ষিত-মনের যোগসাধন করিয়া দিবার জন্য' রবীন্দ্রনাথ বিশ্বভারতী থেকে বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহ গ্রন্থমালা প্রকাশে ব্রতী হয়েছিলেন। এই গ্রন্থমালায়, বিবিধ বিষয়ের সঙ্গে কৃষি ও কৃষির আনুষঙ্গিক নিয়ে পাঁচটি বই ছিল। তবে পাঁচটির বেশি বই-ও থাকতে পারে। আমরা কেবল পাঁচটি রইয়ের খোঁজ পেয়েছি।

এই বইগুলো হল, জমি ও চাষ-ডক্টর সত্যপ্রসাদ রায় চৌধুরী, যুদ্ধোত্তর বাংলার কৃষি শিল্প ডক্টর মুহম্মদ কুদরত-এ-খুদা, রায়তের কথা প্রমথ চৌধুরী, জমির মালিক অতুলচন্দ্র গুপ্ত ও বাংলার চাষি শান্তিপ্রিয় বসু।

আমরা এখানে কথা বলব শেষ বইটি নিয়ে। এই বইটি -মানে 'বাংলার চাষী' ছাপা হয়েছিল বাংলা ১ জ্যৈষ্ঠ ১৩৫১ সালে। প্রকাশ করেছিল বিশ্বভারতীর পক্ষে বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, ২ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট ঠিকানা থেকে।বইটি ছোটখাট, ১/৮ ডিমাই আকারে ৬২ পাতার। বইতে পরিচ্ছেদ দশটি, পরিচ্ছেদগুলি হল রায়তের দারিদ্র্য, কৃষিজীবীর সংখ্যাবৃদ্ধি, জমির অভাব, অবনত কৃষি, চাষির ঋণ, ভূস্বত্ব, ভাগচাষি, খণ্ডিত ও অসংবদ্ধ জোত, কৃষি মজুর ও চাষির ভবিষ্যৎ।

বইটায় স্বাধীনতা-পূর্ব কৃষি নিয়ে কথা আছে। বেশি কথা আছে স্বাধীনতা -পূর্ব ৩ ও ৪ দশক নিয়ে। এখন যেমন কৃষিতে সংকট ও সমস্যা, তখন কিন্তু তেমন ছিল না। তখন কৃষিতে আসা মানুষের সংখ্যা বাড়ছিল। এই সংখ্যা কেন বাড়ছিল–কীভাবে বাড়ছিল তার বৃত্তান্ত এখানে আছে।

**প্রসদ**

আশ্চর্য এক তথ্য আছে এই বইতে। বলা হয়েছে, কৃষিতে যেমন লোক বেড়েছিল, শিল্পে তেমনই নাকি লোক কমছিল।

অনেক আগ্রহব্যাঞ্জক বৃত্তান্ত আছে জোত নিয়ে। বর্ণনা আছে জোতের বিশেষত্ব নিয়ে। বলা আছে, জোত কীভাবে সেইসময় টুকরো টুকরো হয়েছে। আবার ভাগচাষি ও কৃষিমজুর নিয়ে অনেক কথা আছে। ১৯১১-১৯৪৩ জেলওয়াড়ি দৈনিক মজুরির হারের নথি আছে।অনেকগুলো পরিসংখ্যান আছে- আদমশুমারির খানিক তথ্য আছে, বিভিন্ন সমীক্ষার তথ্য আছে। যেমন ১৯৩৬-৩৭ সালের বিভিন্ন শ্রেণির কৃষকদের ধরে ধরে তাদের আয় ব্যয়ের খতিয়ান আছে, আবার ১৯৩৬-৩৭ সালের নিত্যদ্রব্যের মূল্য তালিকা আছে। একটা পাতাজোড়া বিস্তারিত সারণী আছে, দুই বাংলার পরিবার-প্রতি জমির পরিমাণ নিয়ে।

বইটা এখন বাজারে নেই। আমাদের লাইব্রেরির সংগ্রহে আছে। উৎসাহীজন আমাদের অফিসে ফোন করতে পারেন বা যোগাযোগ করতে পারেন আমাদের গ্রন্থাগারিক শুক্লা দেব মিত্র-এর (৯৪৩৩০৮৬৮৫৫) সঙ্গে।

অনিকেত

■■

বাংলার চাষি।। শান্তিপ্রিয় বসু।। বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহ গ্রন্থমালা।। বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়।।

---

# শুষনি

**দ্রব্যগুণ**

শুষনি শাক সবসময় পাওয়া যায়। আপনা থেকেই জলাশয়ের ধারে বা ধানখেতের আশেপাশে প্রচুর পরিমাণে হয়। ছড়ানো ধরনের লতানে গাছ। চাষ করতে হলে বর্ষার ভিজে জমিতে লতা কেটে লাগাতে হয়। বীজ সংগ্রহ করেও লাগানো যায়।

ভেজে ও ঝোল করে খাওয়া হয়। দিনে ২-৩ বার ৪ চামচ রস কিংবা ঝোল ওজন কমায়। হজমশক্তি ও দেহের শক্তি বাড়ায়। মেধা বাড়ায়। হাঁপানি রোগীরা উপকৃত হয়। এই শাকের বীজ বেঁটে ঘোলের সঙ্গে খেলে প্রস্রাব ভালো হয়। ■■

সূত্র : বাংলার শাক

---

# নোনা সহনশীল ধানের পরীক্ষা

দক্ষিণ ২৪ পরগনার ইন্দ্রপ্রস্থে নোনা সহনশীল দেশি ধানের পরীক্ষা হয়েছে। ইন্দ্রপ্রস্থ গ্রাম পাথরপ্রতিমায়। ইন্দ্রপ্রস্থ গ্রামের ডাকঘর বিশ্বনাথপুর। ধান করা হয়েছে ৩৩ শতক মতো জমিতে। পরীক্ষা হয়েছে নোনা সহনশীল ২৭ জাত নিয়ে।

২৭টি জাতের মোট ৫ কেজির কিছু বেশি বীজ নিয়ে পরীক্ষা হয়। এর মধ্যে তিনটে কেরলের, বাকিগুলো বাংলার। কেরলের ধানের নাম আরুগাথার কুরাভা, নাভাবা ও থাভাল্লা কানন। বাংলার ধানের ভেতর ছিল দুধেশ্বর, সুনসৌ, ঘেউস, শোলের পনা, মরিচ-শাল, অগ্নিশাল, কাটারিভোগ, তুলইপাঞ্জি, বন্দনা, নাঙাল মুড়া, কালো নুনিয়া, নিক্কো, গোবিন্দভোগ, কামিনীভোগ, স্বভাগী, হোগলা, কনকচূড়, নোনাশ্রী, বিরই, তালমুগুর, অন্নপূর্ণা, পালই, চামরমণি, রামশাল। গড়ে ১১টি করে পাশকাঠি পাওয়া গেছে চারটি ধানে। এই ধানগুলি হল তালমুগুর, পালুই, চামরমণি ও দুধেশ্বর। ১৫-১৮টি পাশকাঠি পাওয়া গেছে শোলের পনা ও নাঙাল মুড়ায়। ১৮-২০ টি পাওয়া গেছে মরিচশালে। বাকিগুলি কমবেশি ৩-৪, ৪-৬, ৮-৯টি পাশকাঠির। সবচেয়ে লম্বা শিষ হয়েছে গোবিন্দভোগের-২৯ সেন্টিমিটার।২৭ সেন্টিমিটার শিষ হয়েছে ৩টি ধানের আর ২৬ সেন্টিমিটার ৪টির। বাকিগুলোর শিষ ২১থেকে ২৪ সেন্টিমিটারের ভিতরে। গুছি প্রতি শিষ সবচেয়ে বেশি পাওয়া গেছে শোলের পনায়, ১২-১৫টি। ■■

**বিকল্প**

### নৈনিতালপুকুর

নৈনিতাল লেকের জল কমছে। এই লেক নৈনি লেক। এ বছর গরমকালে এই লেকের জল নেমেছে ১৬ ফুট। এর কারণ অতি দূষণ ও পলি, এর কারণ পর্যটকের জন্য লেকের জল তোলা, এর কারণ লেকের ধার ঘেঁসে হোটেল-ইমারত বেড়ে যাওয়া। এমন বলছেন অধ্যাপক প্রকাশ তেওয়ারি। অধ্যাপক তেওয়ারি কুমায়ুন বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিবেশ বিভাগের।

### না গোয়া

জৈব বৈচিত্র রক্ষা নিয়ে 'নাগোয়া প্রোটোকল' আছে। প্রোটোকল-মাফিক নাকি দেশে জৈব বৈচিত্র রক্ষা পাচ্ছে, প্রোটোকল-মাফিক নাকি, স্থানীয় জনগোষ্ঠী সুফল পাচ্ছে—এমন বলা হয়েছে এক সম্মেলনে। সম্মেলনটি জৈব বৈচিত্র রক্ষার। সম্মেলন হয়েছে দিল্লিতে-অগস্ট ২০১২ তে। আয়োজক ছিল বন ও পরিবেশ মন্ত্রক। নিন্দুক বলছে, কথাটা ঠিক না। নিন্দুক বলছে, জিন সম্পদের বাইরে চালান হচ্ছে।

### যমযমাট

শিল্প ও কৃষি রাসায়নিক, বিশ্বজুড়ে মৃত্যুর অন্যতম কারণ। শিল্প ও কৃষি রাসায়নিক, পৃথিবীর পাঁচ প্রধান মৃত্যুর কারণের সেরা। এই সংখ্যা বছরে দশলক্ষেরও বেশি। এমন জানাল, রাষ্ট্রসঙ্ঘের এক প্রতিবেদন। প্রতিবেদন আরও বলল, গোটা বিশ্বে বিক্রি হয় দেড় লক্ষ রাসায়নিক—যার নামমাত্রের আজ অব্দি মূল্যায়ন হয়েছে। আর সব দেশে, বিশেষত ভারত ও চিনের রাসায়নিক স্বাস্থ্য ও পরিবেশের পক্ষে বিপজ্জনক হয়ে উঠেছে। রাষ্ট্রসঙ্ঘ বলছে, ২০২০-র মধ্যে বিশ্বকে রাসায়নিক মুক্ত করার উদ্যোগ নিতে হবে।

### অক্সফোর্ড উবাচ...

জলবায়ু বদল ও দারিদ্র নিয়ে অক্সফ্যামের বিবৃতি। বিবৃতি বলছে, আগামীদিনে জলবায়ু বদলে গরিবের সংকট বাড়বে। এই সংকট, জলবায়ু বদলের বিপদ নিয়ে তৈরি এতাবৎ যাবতীয় সমীক্ষার ফলকে ছাড়িয়ে যাবে। নিত্য-দ্রব্য ও খাদ্যের অভাব হবে। আর খাদ্যদ্রব্যের দাম হবে আকাশছোঁয়া।

### শকুন বনাম শকুনি

শকুন কমার জন্য পশু চিকিৎসার যন্ত্রণানাশক ওষুধ ডাইক্লোফেনাক নিষিদ্ধ। কিন্তু বাজারে এখন চুপিসারে অ্যাসিক্লোফেনাক। কিন্তু অ্যাসিক্লোফেনাক শকুনের জন্য সমান বিপজ্জনক। এমন বলছে জার্নাল অফ র‍্যাপ্টর রিসার্চ।

### তিনে নেত্র

কাঞ্চনজঙ্ঘা রেঞ্জ বরাবর জৈব বৈচিত্র করিডর। মানে জৈব বৈচিত্র রক্ষা-ব্যবস্থা। সীমা পেরিয়ে বন্যপ্রাণী অন্য দেশে ঢুকছে, অন্য দেশের সীমান্ত প্রহরী গুলি ছুঁড়ছে—মারা যাচ্ছে প্রাণী। এই করিডর এই মৃত্যু থামাতে। সঙ্গে চোরাশিকার বন্ধ করা, পশুচারণ কমানো, দাবানল ও পশুরোগ রোধের কথাও আছে। এই করিডর—ব্যবস্থায় আছে তিন দেশ—ভারত-নেপাল-ভুটান।

### এরকম হয় নাকি ?

সিকিম দেশের প্রথম জৈব-খেতের-দেশ হবে ঠিক করেছে। এর লক্ষ্য-বর্ষ ২০১৫। এজন্য সিকিম স্টেট অর্গানিক বোর্ড ও বিবিধ রাজ্য দফতর একযোগে কাজ করবে। সিকিমের মুখ্যমন্ত্রী রাজ্যের সমস্ত চাষকে জৈবচাষে বদল করতে বিধানসভায় প্রস্তাব অনুমোদন করিয়েছেন। জৈব চাষের পাশাপাশি এখানে অর্গানিক ইকো ট্যুরিজম-এর ব্যবস্থাও গড়ে তোলা হবে।

### ডুবে ডুবে জল ...

পাপুয়া নিউগিনির সমুদ্র উপকূল থেকে তামা ও সোনা তোলা হবে। এজন্য কানাডার নটিলাস মিনারেলসকে ওদেশের সরকার কুড়ি বছরের লাইসেন্স দিয়েছে। এর বিরুদ্ধে সোচ্চার দ্য ডিপ সি মাইনিং ক্যাম্পেন। এই ক্যাম্পেন, নানা স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা ও পরিবেশবিদদের যুক্তসভা। মনে করা হচ্ছে, এশীয়-প্রশান্ত মহাসাগরীয় এলাকায় প্রায় দশলক্ষ বর্গকিলোমিটার সমুদ্রতল খননের জন্য লাইসেন্স দেওয়ার পরিকল্পনা বিভিন্ন মহলে চলছে।

### মেরু-দণ্ড !

মেরুসাগর থেকে ৯০০ ঘনকিলোমিটার বরফ অদৃশ্য। এমন বলছে ইউরোপীয় স্পেস এজেন্সি। বরফশূন্য হয়ে এলে মেরুসাগরে মাছধরা, তেল তোলা ও খনিজ সম্পদের অভিযান বাড়বে, জলবায়ু ভারসমতায় নতুন উপসর্গ দেখা দেবে।

### দেখেছো ?

শ্রীলঙ্কায় কুড়ি হাজার মানুষের যকৃতের জটিল রোগ। ওদেশের চল্লিশোর্ধ্ব মানুষজন, যার দশ বছরের বেশি চাষবাদ করছে তাদের এই অসুখের আরো শঙ্কা। এমন সংশয় ওদেশের বিজ্ঞানীদের। হু শ্রীলঙ্কাকে আমদানি করা সার-কীটনাশকে যাচাইয়ের মান বানাতে বলেছে, আর ওই সার কীটনাশকে আর্সেনিক-ক্যাডমিয়াম আছে কিনা পরখ করতে বলেছে।

### ১০০°

স্টকহোমে 'বিশ্ব সলিল সপ্তাহ ২০১২' অনুষ্ঠিত হল। যোগ দিল একশোর বেশি দেশের রাজনীতিক, পদস্থ আমলা ও আন্তর্জাতিক সংগঠন প্রধানরা। আলোচনা হয় জল ও খাদ্য সুরক্ষা নিয়ে। সেচের ঠিক ব্যবহার ও খাদ্য অপচয় এড়াতে সরাসরি ও ব্যক্তিগত উদ্যোগের উপর জোর দেওয়ার কথা হয়। কথা হয়, জল-রক্ষার কার্যকারি পদ্ধতি উদ্ভাবনের।

### বাতায়নে রবি

সৌরশক্তির জন্য ছাদে আর প্যানেল লাগাতে হবেনা। ঘরের জানলাই যথেষ্ট। এখন থেকে জানলার শার্সি দিয়েই এই কাজ হবে। অবলোহিত আলো-সহনশীল পলিমার দিয়ে শার্সির কোষগুলো তৈরি হবে। তার ওপরে থাকবে রুপোর স্বচ্ছ ফিল্ম। এই পলিমার-সৌরকোষ সাধারণ আলোর বদলে অবলোহিত রশ্মি সঞ্চয় করবে। এই কোষ ওজনে হালকা। এসব জানিয়েছে এসিএস ন্যানো পত্র।

### বৃক্ষদেবতা ! !

গাছ অনেক বেশি দূষণকারী সামগ্রী পরিবেশ থেকে শুষে নিতে পারে। হালের এক সমীক্ষা এমন বলছে। বাতাস দূষণে নাইট্রোজেন-ডাই-অক্সাইড ও মাইক্রোস্কোপিক পার্টিকুলেট ম্যাটারের বড় ভূমিকা। যে দুটোকে গাছ শুষে নিতে পারে অনেকটাই। এই শুষে নেওয়ার মাত্রা যা ভাবা গিয়েছিল তার আটগুণ।

### যাচ্ছেতাই ! !

আন্দামানে নারকোনডাম-ধনেশ পাখির অস্তিত্ব সংকটে। এই ধনেশ আন্দামানের নারকোনডাম দ্বীপের। ধনেশের সংকটের কারণ উপকূলরক্ষী বাহিনীর রাডার তৈরি ও একটি ডিজেল-বিদ্যুৎ কেন্দ্র তৈরির প্রস্তাব। এর জন্য স্যাঙ্কচুয়ারির ভেতর দিয়ে ২ কিলোমিটার চওড়া রাস্তাও বানাতে হবে। এর মধ্যেই, দ্বীপের ৫০ হেক্টর গেছে পুলিশ ফাঁড়ির জন্য। আরো ইমারত, দ্বীপের ব্যাপ্ত-অতুল উদ্ভিদ ও প্রাণী বৈচিত্রের অপূরণীয় ক্ষতি করবে।

দ্বীপে কমবেশি ৩৫০টি ধনেশ আছে। এই সংখ্যাও কমার দিকে। ন্যাশনাল বোর্ড অফ ওয়াইল্ডলাইফ-এর স্ট্যান্ডিং কমিটির আমন্ত্রিত সদস্যরা এই প্রস্তাব পত্রপাঠ নাকচ করেছে। যদিও পরিবেশ ও বনমন্ত্রক এইসব কথায় কান দেয়নি, তারা প্রকল্প মঞ্জুর করেছে।

### হিতোপদেশ

জিনশস্য নিয়ে কৃষি-বিষয়ক পার্লামেন্টারি স্ট্যান্ডিং কমিটির রিপোর্ট পেশ। রিপোর্টের জন্য সময় লাগল আড়াই বছর। কমিটি ছিল ৩১ জনের। রিপোর্টের পাতা সংখ্যা ৪৯২। কমিটির মত, কৃষি, স্বাস্থ্য, পরিবেশ ও খাদ্যের ওপর জিন ফসলের বিরূপ প্রতিক্রিয়ার কারণে জিনশস্য দেশের খাদ্য সমস্যার ঠিক সমাধান নয়। জিএম ফ্রি ইন্ডিয়া নামের সমন্বয়,কমিটির রিপোর্টকে ঐতিহাসিক আখ্যা দিয়ে সরকারকে জিন কারিগরি ব্যবহারের রাশ টানতে অনুরোধ করেছে।

সম্পাদক : সুব্রত কুন্ডু
সম্পাদনা সহযোগী : সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়
হরফ : শিপ্রা দাস রূপ : অভিজিত দাস
মুদ্রাকর : লক্ষ্মীকান্ত নস্কর

Book Post
Printed Matter

ডেভলপমেন্ট রিসার্চ কমিউনিকেশন অ্যান্ড সার্ভিসেস সেন্টারের পক্ষে সুব্রত রানা কর্তৃক ১৮বি গড়িয়াহাট রোড (সাউথ) ঢাকুরিয়া, কলকাতা-৩১ থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।
যোগাযোগ : প্রজেক্ট অফিস, ৫৮এ ধর্মতলা রোড, বোসপুকুর, কসবা, কলকাতা-৪২, দূরভাষ : ২৪৪২ ৭৩১১, ২৪৪১ ১৬৪৬, ফ্যাক্স : ০৩৩ ২৪৪২ ৭৫৬৩
ই-মেল : drcsc@vsnl.com, www.drcsc.org